গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা ৯ - ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

টাকা না দিলে পড়ার সুযোগ মিলবে না — কান্তি বিশ্বাস কমিটির ফতোয়া

প্রতিবাদে গর্জে উঠল ছাত্র সমাজ

২ সেপ্টেম্বর কোন সংবাদপত্র দেখে বোঝার উপায়ই ছিল না আগের দিন কলকাতায় বিশাল ছাত্র মিছিল রাজপথ মুখরিত করেছিল। সেদিন এই মিছিলের যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, পরের দিনের কাগজ দেখে তাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, এর নাম নাকি নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা! প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই মিছিলের প্রচারে কেন এত নীরবতা? একথা সত্য, জ্বলন্ত প্রদীপ যেমন অন্য প্রদীপ জ্বালাতে সাহায্য করে, তেমনি একটা লড়াই-আন্দোলন আরও বহু আন্দোলনের জন্ম দেয়। তাই শাসকগোষ্ঠী ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা, যারা লড়াই-আন্দোলন চায় না — তাদের স্বার্থবাহী মিডিয়াগুলো গণআন্দোলনের সংবাদ নিঃশব্দে চেপে দেয়, অথবা তাচ্ছিল্যভরে আন্দোলনকে যানজটের কারণ হিসাবে দেখিয়ে তার গুরুত্বকে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই মিছিলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গত ১ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক ছাত্র শহীদ দিবসে কলকাতার কলেজ স্ট্রীট থেকে রাজভবন অভিমুখে ৩০ হাজার ছাত্রের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল রাজপথ স্লোগানে মুখরিত করে সংগ্রামের বার্তা ছড়িয়ে গেলেও সংবাদমাধ্যমে তা স্থান পেল না। কী ছিল এই মিছিলের দাবি? এই মিছিল দাবি তুলেছিল, 'উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি চলবে না', 'সেল্ফ ফিনান্সিং (টাকা দিয়ে পড়ার) কোর্স চালু করা চলবে না'। এই মিছিল আরও দাবি তুলেছিল, 'স্কুল স্তরে যৌনশিক্ষা চালু করা চলবে না', 'ভর্তি সমস্যার সমাধান করতে হবে', 'ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করতে হবে' প্রভৃতি। বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও এই মিছিলের আয়োজন করেছিল। ভাদ্রের দুপুরের তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল শিক্ষার অধিকার হরণের চক্রান্তের প্রতিবাদ জানাতে। স্বাধীনতার পর থেকেই প্রথমে বুর্জোয়াদের বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, পরে বুর্জোয়াদের অপর পছন্দের দল বিজেপি-ই শুধু নয়, ক্ষমতাসীন সিপিএম প্রমুখ সরকারি বামদলগুলোর উদ্যোগে গঠিত অকংগ্রেসী-অবিজেপি সরকারও শিক্ষাকে চূড়ান্ত ব্যয়বহুল করে, 'আসন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্কীম' চালু করে ব্যাপক ছাত্রকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বর্তমান ইউ পি এ সরকার পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে যে কমিশন বসিয়েছিল, তারাও উচ্চশিক্ষায় ব্যাপক ফি-বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। এরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ আই ডি এস ও এদেশের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাই ছাত্রদের মধ্যে তুলে ধরেছে যে, সত্য জানার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন শোষিতশ্রেণীর; শোষকশ্রেণীর সত্যকে চাপা দেওয়াই কাজ। ফলে সত্যানুসন্ধানের যতটুকু সুযোগ ক্রমসংকুচিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আজও রয়েছে, এদেশের শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনে তাকে রক্ষা এবং সম্প্রসারিত করার জন্য এ আই ডি এস ও সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

সঠিক যুগোপযোগী আদর্শ ও তাকে হাতিয়ার করে উন্নত সংস্কৃতি ও নৈতিকতার আধারে গড়ে ওঠা এই সংগ্রামের প্রতি ছাত্রছাত্রীরা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। এই বিশাল ছাত্র সমাবেশ তারই সাক্ষ্য বহন করে। এই সময়ে এত বিশাল সমাবেশ সংগঠিত করা সহজসাধ্য ছিল না। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ — সর্বত্রই স্কুলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের প্রি-টেস্ট, অন্যান্য ক্ষেত্রে ষান্মাসিক পরীক্ষা বা টার্মিনাল পরীক্ষাগুলো এসে যাওয়ায়, ইচ্ছা থাকলেও এই সমাবেশে আসতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা ছিল। কলেজগুলিতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এস এফ আই এবং অন্যত্র ছাত্র পরিষদ বা তৃণমূল ছাত্রপরিষদ পরিচালিত ইউনিয়নগুলো কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের শিক্ষা-স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রেখেছে শুধু নয়, বহুক্ষেত্রে ডি এস ও'র প্রচারকার্যে বাধা দিয়ে, আক্রমণ নামিয়ে এনে, কলেজগুলিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এই আন্দোলন ভাঙার ক্ষেত্রে তারা শাসকদলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এই মিছিলে যাতে ছাত্রদের সংগঠিত করে নিয়ে আসতে না পারে সেজন্য কলকাতার এক ডি এস ও কর্মীকে সিপিএম মদতপুষ্ট কিছু লোক থানায় নিয়ে যায় এবং তার নামে মিথ্যা এফ আই আর করার জন্য পুলিশকে চাপ দিতে থাকে। কোন কোন স্কুলে শাসকদলের মদতপুষ্ট কতিপয় শিক্ষকও এই সমাবেশে ছাত্রদের আসতে বাধা দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য আন্দোলনে কর্মীরা যুক্ত থাকায় এই সমাবেশের প্রস্তুতির জন্য সময়াভাব ছিল। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া যায়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও এই বিশাল সমাবেশ প্রমাণ করে এই সংগঠন ও তার আন্দোলনের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ কত গভীর।

সকাল থেকেই ছাত্র আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত কলেজ স্ট্রীটে বিভিন্ন জেলা থেকে শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে ছাত্রছাত্রী জমায়েত হতে থাকে। দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগান থেকে শুরু করে ওরা এসেছিল সুন্দরবনের চাষী পরিবার থেকে, এসেছিল ভাঙন

সাতের পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু ঃ জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

ডেঙ্গু সহ অজানা জ্বরে যেভাবে রাজ্যবাসী আক্রান্ত হচ্ছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়ে বলেন,

পশ্চিমবঙ্গে শুধু ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়াতেই নয়, কোন এক অজানা জ্বরে কয়েক হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে এবং বেশ কিছু মানুষ মারা গেছে ও যাচ্ছে — এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি হয়ত অবগত আছেন। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতির দিনে একটা জ্বর রাজ্যবাসীকে আক্রমণ করছে, অথচ সেই জ্বরের চরিত্র, কারণ, প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও চিকিৎসা পদ্ধতি অজানা থেকে গেল, চিকিৎসকরাও অসহায় বোধ করছে। এরাজ্যে না হোক, দেশের অন্যত্র বা বিদেশে কোথাও এ সম্পর্কে সাহায্য করতে পারে এমন কেউ কি নেই ? রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে উদ্যোগী হচ্ছে না কেন ?

আপনি 'স্বাস্থ্যনগরী' ও এই ধরনের কিছু 'নগরী', 'পার্ক', 'মল' ইত্যাদি গড়ে তুলতে এবং তার জন্য বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মন জয় করতে খুবই ব্যস্ত এটা জানি এবং এটাও জানি প্রস্তাবিত 'স্বাস্থ্যনগরী'তে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ধনীদের আধুনিক চিকিৎসার সব ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু এই রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে কয়েক হাজার হেল্‌থ সেন্টার বন্ধ করে, হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ব্যাপক সংখ্যায় কমিয়ে, চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম, ঔষধপত্র সরবরাহ সঙ্কুচিত করে, চার্জ বাড়িয়ে এবং নতুন হাসপাতাল না খুলে এবং রুগীর বেড না বাড়িয়ে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে গরিব মানুষ, দিনমজুর, বস্তিবাসী ও মধ্যবিত্তদের বিনা চিকিৎসায় অনিবার্য মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ থাকছে না। এটা খুবই মর্মান্তিক যে, শুধু আর্থিক সামর্থ্য নেই বলেই এতগুলি শিশুকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো এবং আরও অনেকে সেই পথেই এগোচ্ছে।

এই অবস্থায় আপনার কাছে দাবি জানাচ্ছি ঃ

১। রাজ্যে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা বিবেচনা করে বিপদ মোকাবিলায় সমস্ত বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ, সকল চিকিৎসক সংগঠন ও স্বাস্থ্য সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের বৈঠক ডাকুন এবং সম্মিলিত মতামত ও সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

২। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্য নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ও ঔষধ সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন।

৩। প্রত্যেক হাসপাতালে অতিরিক্ত ইমারজেন্সি ওয়ার্ড, অধিক বেড, চিকিৎসক, নার্স ও ঔষধের ব্যবস্থা করুন।

৪। মৃতদের পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিন।

আশা করি আপনি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এই দাবিগুলি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কার্যকর করবেন।

আপনি কলকাতায় না থাকলেও নিশ্চয়ই আপনার দপ্তর জরুরি বিবেচনা করে আপনাকে এই বক্তব্য জানাবে এটা অবশ্যই আশা করতে পারি।

‘স্বাস্থ্যের অধিকার সপ্তাহ’ পালন করল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারীকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের নীল নক্‌শা পিপিপি (প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ) বাতিল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির আহ্বানে ২৫-৩১ আগস্ট ‘স্বাস্থ্যের অধিকার সপ্তাহ’ হিসাবে পালিত হয়। দাবি ব্যাজ পরিধান, মাইক প্রচার ও অবস্থান কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মথুরাপুর ব্লক হাসপাতাল, নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতাল, নাইয়ারহাট ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মোমরেজগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চালতাবেড়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এই কর্মসূচি পালিত হয়। ৩০ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে ১-৩০টা পর্যন্ত নিমপীঠ হাসপাতাল গেটে অবস্থান হয়। এই অবস্থানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন জেলাপরিষদ সদস্য অমূল্যধন মণ্ডল। সরকারি স্বাস্থ্যনীতির জনবিরোধী দিকগুলি এবং এই হাসপাতালের পরিষেবার বিভিন্ন ঘাটতির দিকগুলো তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ডাঃ হান্নান হালদার, মাধবী প্রামাণিক, সোফি পৈলান, আনসার সেখ, শৈলেন হালদার, নীলোৎপল মণ্ডল, সি এইচ জি কর্মী নিরঞ্জন হালদার প্রমুখ। ৯ জনের প্রতিনিধিদল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তুলে দেওয়া কিংবা ডাক্তার তুলে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কার্যত অচল করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, পর্যাপ্ত পরিমাণে সাপে কাটা ও কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ সরবরাহ সহ ১০ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি বিএমওএইচ-এর কাছে প্রদান করেন। তিনি বলেন, নলগোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৩ মাস পরে ডাক্তার যেতে পারে। অ্যানাস্থেসিস্ট ও টেকনিসিয়ান না দেওয়ায় ও টি-র যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে, এক্স-রে মেসিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ডেপুটেশন শেষে ডাঃ হান্নান হালদার সর্বত্র এর বিরুদ্ধে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুরের দুটি হাসপাতালকে উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, সদর হাসপাতালকে তুলে না দেওয়া, হাসপাতালে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও দালাল মুক্ত করা, মহকুমা সহ জেলা সদর হাসপাতালে সর্বক্ষণের জন্য অপারেশন, ব্লাড ব্যাঙ্ক ও ইসিজি মেসিন চালু রাখা, জেনারেটর ব্যবস্থা রাখা, বেকিবাগান গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নিয়ে পুনরায় হাসপাতাল চালু করা, ডেঙ্গু সংক্রমণের প্রতিষেধক ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রতিরোধক ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে করা, চুরি-দুর্নীতি-স্বজনপোষণ-অপচয়-প্রশাসনিক গাফিলতি দূর করা, হাসপাতালে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ, পথ্য ও রক্তের জন্য অর্থ নেওয়া বন্ধ করা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্যে রচিত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতি প্রত্যাহার সহ ২০ দফা দাবি নিয়ে ‘হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি’র এক প্রতিনিধি দল ২৯ আগস্ট বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (সিএমওএইচ)কে এক স্মারকলিপি প্রদান করে। সিএমওএইচ দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে কিছু সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। সাজেম আলি, রত্না বাগচী, ডাঃ এম এ সবুর, ডাঃ রবিউল আলম, আলি আকবর, ধনঞ্জয় ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ডেপুটেশনে অংশ নেন।

কোচবিহার

২৯ আগস্ট কোচবিহার শহরের কেন্দ্রস্থলে সদর এম জে এন হাসপাতালের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি এবং কেন্দ্রের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিকে অনুসরণ করে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ, হাসপাতালে রোগীদের হয়রানি ও হেনস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালের জমিতে মার্কেট কমপ্লেক্স-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলে কোচবিহারবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরাও এই ঘটনাকে সুনজরে দেখছেন না। অবস্থান বিক্ষোভে বিভিন্ন বক্তারা মার্কেট কমপ্লেক্সকে প্রতিহত করতে সমস্ত নাগরিকদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

২৯ আগস্ট কোচবিহারে সদর এম জে এন হাসপাতালের সামনে অবস্থান

বীরভূম

ছানির অপারেশন করাতে গিয়ে চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া পাঁচ রোগী ২৮ আগস্ট বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন। হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সঙ্গে স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে গিয়ে স্মারকলিপি দিয়ে চোখের পরিবর্তে কাজের দাবি জানালেন তাঁরা। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্যামাপদ বসাক জানান, ‘‘সমাজকল্যাণ দফতরের মাধ্যমে কিছু আর্থিক সাহায্য করা হবে। তাছাড়া সামাজিক কোনও কাজে তাঁদের যুক্ত করা যায় কি না ভাবা হবে।’’ জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষে মানস সিংহ ওই রোগীদের সাহায্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ১১ দফা দাবিপত্র পেশ করেন। তার আগে দফতরের সামনে এক জনসভা হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক, মানস সিংহ, স্বাধীন দলুই, ইরা বোস, লালন দাস, কমল বণিক, জাসমীর খাঁ প্রমুখ। গত ১১ জুন সিউড়ি হাসপাতালের গাফিলতিতে ওই পাঁচ রোগী অন্ধ হয়ে যান। মনোরমা মণ্ডল, মুন আলম বিবি, কেষ্ট দাস, সর্বাণী দাস, শেখ সুজাউদ্দিনের একটি করে চোখ তুলে ফেলার মতো পরিস্থিতি হয়। সকলেই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী। ফলে গত দু'মাসে সকলের দু-বেলা খাবার জোটেনি। জেলা প্রশাসন এঁদের দিকে কোনও সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। ৭ সেপ্টেম্বর মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের সামনে এঁদের হাজির করা হবে। রামপুরহাটেও অন্ধ হয়ে যাওয়া রোগীদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করেনি সরকার। এঁদের স্বনির্ভরতার পাশাপাশি দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করা হয়।

কলকাতা

কলকাতা মহানগরীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া, জন্ডিস ও জলবাহিত রোগের প্রকোপ এবং পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ, জলনিকাশি এবং সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষা সহ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ৩০ আগস্ট পৌরভবনের সামনে অবস্থান চলে, বিক্ষোভ-ডেপুটেশন দেওয়া হয় কলকাতার মেয়রের কাছে। ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত।

সমস্ত সমস্যা স্বীকার করে নিয়ে মেয়র জানান যে — কলকাতাকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার জন্য যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা দরকার তা জানা সত্ত্বেও তারা এর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করবেন না। বর্তমান পরিকাঠামোকে তারা কেবল চালু রাখার চেষ্টা করবেন এবং এ জন্যও নাগরিকদের অর্থমূল্য দিতে হবে। তার কারণ তাঁর মতে, কলকাতায় দারিদ্র্যসীমার নীচের কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মেয়রের এই বক্তব্যকে অসত্য, অবাস্তব এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত আখ্যা দিয়ে ডাঃ সামন্ত এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ভ্রম সংশোধন

কৃষিতে বর্ধিত বিদ্যুৎমাশুলের প্রতিবাদে, গত সংখ্যায় প্রকাশিত বিক্ষোভের রিপোর্টে, মাশুলবৃদ্ধির পরিমাণ ভুল ছাপা হয়েছে। ওটা হবে বছরে, ৫,৪৬০ টাকা থেকে ১০,৯৩০ টাকা। এই মুদ্রণপ্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক, গণদাবী

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

গত ২১ জুলাই পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানায় দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড শ্যামাপদ মুর্মু দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৮ আগস্ট হুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমরেড শ্যামাপদ মুর্মুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। পার্টি ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে কমরেড মুর্মুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড কেনারাম মণ্ডল বলেন, কমরেড শ্যামাপদ মুর্মু ৭০-এর দশকে দলে যুক্ত হন। সেই সময় এই জেলায় সংগঠনের অবস্থা আজকের মত ছিল না। ছিল না ঘরে ঘরে আশ্রয়। সেই অবস্থায় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠনের কাজ করে গেছেন। এ জেলায় যখন আদিবাসীদের মধ্যে পৃথক আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবিকে কেন্দ্র করে আবেগ কিছুটা হলেও কাজ করছিল, সেই সময় শ্যামাপদ মুর্মু সমস্ত সঙ্কীর্ণ চিন্তাভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে মহান নেতা শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রচার করেছেন। শেষজীবনে তিনি অসুস্থতার কারণে আগের মত সংগঠনের কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু পুত্র সহ পরিবারের সকলকে দলের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধান। এছাড়াও স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

কমরেড শ্যামাপদ মুর্মু লাল সেলাম

শহীদ ক্ষুদিরাম স্মরণে

উত্তর ২৪ পরগণা

১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরাম দিবসে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের ছোট বাঁকড়া জুনিয়র হাইস্কুলে ফ্রি-মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে। ঐ দিন বাঁকড়া ছাত্র-যুব কমিটি প্রভাতফেরী, মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, ফুটবল টুর্নামেন্ট সহ সারাদিনব্যাপী নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে।

ডাঃ নাসরিন আলি, ডাঃ গোবিন্দ রায়, ডাঃ আশাউল সরদার, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ সমর সরদার প্রমুখ চিকিৎসকরা ক্যাম্প পরিচালনা করেন।

মেদিনীপুর

শহীদ প্রশস্তি সমিতির উদ্যোগে ১১ আগস্ট মেদিনীপুরের নিমতলাচকে এক স্মরণ অনুষ্ঠান হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক গোষ্ঠবিহারী সেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক হরিপদ মণ্ডল, শিক্ষক ও সাংবাদিক মৃণাল চ্যাটার্জী, পঞ্চানন প্রধান, ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি। বক্তব্য রাখেন ক্ষুদিরাম স্মৃতি উদ্‌যাপন কমিটির জেলা সম্পাদক অমল মাইতি।

পরিচারিকাদের ক্ষুদিরাম দিবস পালন

সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত অংশের পরিচারিকা মা-বোনেরা স্মরণ করলেন অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামকে গত ১১ আগস্ট। উদয়াস্ত পরিশ্রমের মাঝেই দুঃখ-দীর্ণ এই পরিচারিকারা গভীর নিষ্ঠায় সংগঠিত করেছেন এই অনুষ্ঠান সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির মথুরাপুর আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে। সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর প্রধান বক্তা সুজাতা ব্যানার্জী শহীদ ক্ষুদিরামের জীবনসংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন। সমিতির আঞ্চলিক কমিটির সভানেত্রী মীরা কর সভায় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অরুণা কর। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শান্তি প্রামাণিক ও পুষ্প পাল।

বেলুড়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্র-যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান মনীষীদের জীবনচর্চা, উন্নত রুচি-সংস্কৃতি ও খেলাধূলা চর্চার আশু প্রয়োজনকে সামনে রেখে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ৯৮তম শহীদ দিবস উপলক্ষে জাজোদিয়া গার্ডেন ময়দানে (বেলুড়ে) গত ২৮ আগস্ট হাওড়া জেলা ডিওয়াইও'র উদ্যোগে নক্ আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্ষুদিরামের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের পর ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতি ও শহীদবেদীতে মাল্যার্পণ করেন হাওড়া জেলা ডিওয়াইও'র সম্পাদক নিখিলরঞ্জন বেরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামাঙ্কিত আটটি দলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন সংগঠনের সদস্যরা।

পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড় বলাই দে, বিশেষ অতিথি প্রাক্তন ‘ফিফা’ রেফারি লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ এবং এ আই ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সভাপতি সুরথ সরকার। অতিথিবৃন্দ খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উদারনীতিবাদকে পরাস্ত করুন

মাও সে-তুঙ

আমরা মতাদর্শগত সংগ্রামের পক্ষে। কারণ, এটাই হল আমাদের সংগ্রামের স্বার্থে পার্টির ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির ভিতরের ঐক্যকে সুনিশ্চিত করার হাতিয়ার। প্রতিটি কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীকে এই হাতিয়ারটি ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু উদারনীতিবাদ মতবাদিক সংগ্রামকে অস্বীকার করে এবং নীতিবিবর্জিত শান্তি বজায় রাখতে চায়। এ জিনিস পার্টি ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির ভিতরে এক অবক্ষয়ী, সবজান্তা (philistine) মানসিকতার জন্ম দেয় এবং কিছু কিছু ইউনিট ও ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধঃপতন ডেকে আনে।

উদারনীতিবাদের বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে ঘটে থাকে। যেমন, কেউ ভুল করছে একথা পরিষ্কার বোঝা সত্ত্বেও যেহেতু সে পূর্বপরিচিত, একই এলাকা বা শহরের লোক, স্কুলের সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্নেহের পাত্র, পুরানো সহকর্মী অথবা পুরানো অনুগামী সেহেতু শান্তি ও বন্ধুত্বের মুখ চেয়ে তার সেই ভুল যেমন চলছে তেমন চলতে দেওয়া। অথবা, বিষয়টির গভীরে ঢুকে আলোচনা না করে সুসম্পর্ক বজায় রাখার খাতিরে ওপর ওপর ভাসাভাসা কিছু আলোচনা করা। এ জিনিস সংগঠন ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক। এ হল এক ধরনের উদারনীতিবাদ।

সংগঠনের কাছে নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের প্রস্তাবগুলি না রাখা, অথচ আড়ালে দায়িত্বহীন সমালোচনা করা। অন্যের সম্পর্কে সমালোচনা খোলাখুলি তাদের সামনে না করে পেছনে ফিসফিস করা, কিংবা নিজের কোনও বক্তব্য মিটিংয়ের মধ্যে না রেখে পরে ব্যক্তিগত স্তরে যত্রতত্র ছড়িয়ে দেওয়া; যৌথ জীবনযাত্রার রীতির কোনও তোয়াক্কা না করে আপন খুশি মত চলা। এ হল উদারনীতিবাদের দ্বিতীয় রূপ।

ব্যক্তিগতভাবে নিজে অসুবিধায় না পড়লে যা চলছে তাই চলতে দেওয়া; ভুল কোথায় হচ্ছে জেনেও যথাসম্ভব মুখ বুজে থাকা, অর্থাৎ নিজে বুঝেসুঝে বা ঝক্কি এড়িয়ে চলা — উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটে দেখা যে, তাকে কেউ যেন দোষ না দিতে পারে। এ হল উদারনীতিবাদের তৃতীয় রূপ।

দলের নির্দেশ না মেনে নিজের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া, সংগঠনের কাছে নিজের বিশেষ বিবেচনা দাবি করা এবং দলের শৃঙ্খলার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। এ হল উদারনীতিবাদের চতুর্থ রূপ।

দলের ঐক্য বা অগ্রগতির স্বার্থে কিংবা দলের কাজ যাতে ঠিকমতো হয় সেই উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পরিবর্তে নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণ, বিবাদ, ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করা, কিংবা প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় খুঁজে বেড়ানো। এ হল উদারনীতিবাদের পঞ্চম রূপ।

ভ্রান্ত চিন্তা বা ধ্যানধারণাকে খণ্ডন না করে শুধু শুনে যাওয়া, এমনকী প্রতিবিপ্লবী আলাপ-আলোচনা শুনেও নীরব থাকা, সেগুলো দলের নজরে না নিয়ে আসা এবং এমন নির্বিকার চিত্তে সেগুলো চলতে দেওয়া যেন এতে কিছুই যায় আসে না। এ হল উদারনীতিবাদের ষষ্ঠ রূপ।

জনগণের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও — তাদের মধ্যে প্রচার-প্রোপাগান্ডার কাজ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অনীহা, জনসভায় দলের বক্তব্যকে তুলে ধরা, জনজীবনের সমস্যাগুলো সম্পর্কে খোঁজ রাখা এবং সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে অনীহা এবং জনগণের প্রতি একটা নিস্পৃহ মানসিকতা ; নিজে যে একজন কমিউনিস্ট সেকথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, আর পাঁচটা অ-কমিউনিস্ট সাধারণ লোকের মতই আচরণ করা। এ হল উদারনীতিবাদের সপ্তম রূপ।

কাউকে জনস্বার্থবিরোধী কাজ করতে দেখা সত্ত্বেও মনে ক্রোধ

ও ঘৃণার উদ্রেক না হওয়া বা তাকে নিরস্ত করার, বা থামানোর, বা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টার পরিবর্তে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। এ হল উদারনীতিবাদের অষ্টম রূপ।

কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা লক্ষ্য স্থির না করে যেমন তেমন করে দায়সারাভাবে কাজ করা এবং তার ফলে ক্রমাগত কাজে গোলমাল পাকানো, ভাবখানা যেন 'যতক্ষণ নামাবলী গায়ে আছে, ততক্ষণ যেভাবেই হোক্ ঘণ্টা নেড়ে গেলেই হলো।' এ হল উদারনীতিবাদের নবম রূপ।

বিপ্লবে নিজে বিরাট অবদান রেখেছেন বলে ভাবতে থাকা, বহুদিন দলে আছেন এই গর্বে স্ফীত হওয়া, সাধারণ কাজের দায়িত্বকে অবহেলার চোখে দেখা অথচ গুরুতর দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অক্ষমতা ও অযোগ্যতা; কর্মক্ষেত্রে ঢিলেঢালা ও তত্ত্বগত বিষয়ের চর্চায় অমনোযোগী হওয়া। এ হল উদারনীতিবাদের দশম রূপ।

নিজের সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্ট এক উদারনৈতিক মনোভাব নিয়ে চলার ফলে নিজের ভুলত্রুটি জানা থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে সংশোধনের জন্য আদপেই কোন চেষ্টা না করা। এ হল উদারনীতিবাদের একাদশ রূপ।

উদারনীতিবাদ সম্পর্কে আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই এগারোটিই হল মুখ্য। এগুলো সবই উদারনীতিবাদের বহিঃপ্রকাশ।

উদারনীতিবাদ বিপ্লবী যৌথ সংগঠনের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক। এ এমন এক ক্ষয়রোগ যা দলের ঐক্যকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে, সংহতিকে দুর্বল করে দেয়, নিস্পৃহ মনোভাবের জন্ম দেয় এবং অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বীজ বপন করে। বিপ্লবী সেনাবাহিনীর ইস্পাতদৃঢ় সংগঠন ও কঠোর শৃঙ্খলাবোধকে এ নষ্ট করে দেয়; কর্মসূচিগুলির বাস্তব রূপায়ণের কাজকে ব্যাহত করে এবং পার্টির প্রভাবাধীন জনতার থেকে পার্টি সংগঠনগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। উদারনীতিবাদ একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রবণতা।

উদারনীতিবাদের জন্ম হয় পেটিবুর্জোয়া আত্মকেন্দ্রিকতার (selfishness) মনোভাব থেকে। উদারনীতিবাদীদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ হল আগে এবং বিপ্লবের স্বার্থ পরে, এবং এখান থেকেই আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ জন্ম নেয়।

উদারনীতিবাদীদের চোখে মার্কসবাদের মূল নীতিগুলো হলো কতগুলো শাশ্বত ও বিমূর্ত শর্তাবলী (abstract dogma)। উদারনীতিবাদীরা মার্কসবাদকে স্বীকার করে কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করে না, অন্তত সর্বাঙ্গীণভাবে করে না; তারা তাদের উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

উদারনীতিবাদ আসলে সুবিধাবাদের এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ যা মৌলিকভাবে মার্কসবাদ বিরোধী। এর পরিণতি নেতিবাচক এবং কার্যত এর ফলাফল শত্রুপক্ষের হাতকেই শক্ত করে; এবং সেই কারণেই আমাদের শত্রুরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে যাতে এটি আমাদের মধ্যে টিকে থাকে।। এই যখন এর চরিত্র তখন বিপ্লবীদের কখনই একে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

উদারনীতিবাদের নেতিবাচক প্রভাবকে নির্মূল করার জন্য আমাদের চর্চা করতে হবে মার্কসবাদ, যা হল পজিটিভ। প্রতিটি কমিউনিস্ট হবেন উদারচেতা, দৃঢ়মনা এবং কর্মোদ্যোগী — বিপ্লবের স্বার্থই যার প্রাণ এবং নিজের প্রয়োজনকে যিনি বিপ্লবের প্রয়োজনের তুলনায় গৌণ করে দেখেন; যিনি সমস্ত সময় এবং সমস্ত ক্ষেত্রে নীতিনিষ্ঠ আচরণ করেন এবং সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাপদ্ধতি এবং কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং এইভাবে পার্টির যৌথ জীবনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা (consolidate) করেন এবং পার্টি ও জনগণের মধ্যে মৈত্রীকে সুসংহত করেন। একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের উচিত, যেকোনও একজন বিশেষ ব্যক্তির পরিবর্তে দল জনগণের চিন্তাতেই অধিকতর মগ্ন থাকা ও নিজের পরিবর্তে অন্যদের কথা বেশি চিন্তা করা। একমাত্র তবেই তিনি একজন কমিউনিস্ট বলে বিবেচিত হবেন।

আমাদের মধ্যে অনেকের আচার-আচরণে উদারনীতিবাদের যে ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে — সমস্ত নিষ্ঠাবান, সৎ, উদ্যোগী এবং দৃঢ়চেতা কমিউনিস্টকে ঐক্যবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে এবং যাদের মধ্যে উদারনীতিবাদের ঝোঁক আছে তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসতে হবে। আদর্শগত ক্ষেত্রে এটি আমাদের একটি অন্যতম কর্তব্য।

পুঁজির গোলামের মুখে মার্কসের নাম কেন

গত ৩০শে জুলাই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে কলকাতার উপকণ্ঠে বানতলা চর্মনগরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে কংগ্রেসের আর্থিক-সংস্কার নীতিকে কার্ল মার্কসের চিন্তাভাবনারই একটা বিস্তৃত রূপ বলে বর্ণনা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। দেশের সর্বত্র বিদেশি পুঁজির অবাধ যাতায়াতে ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সিপিএম সরকারের অনুকূল ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে কার্ল মার্কসের ১৮৫৩ সালে নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে প্রকাশিত 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' (The Future Results of British Rule in India) নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ''ভারতের উৎপাদনী শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারত ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।'' এরপর অর্থমন্ত্রী বলেন, ''বর্তমান প্রসঙ্গে লিখতে বসলে মার্কস নিশ্চয় আধুনিক ব্যাঙ্ক ও বীমা শিল্পের অভাব নিয়ে অভিযোগ করতেন। কাস্টমসের সমস্যা, বিদেশি মুদ্রা নিয়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ এসব নিয়েও অভিযোগ করতেন তিনি।'' (আনন্দবাজার, ৩১.৭.০৫)

অর্থমন্ত্রী হার্ভার্ড ফেরত অর্থনীতিবিদ। ফলে দেশের অর্থনীতির বিকাশের ধারাটি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল এবং মার্কসের যে নিবন্ধটি থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটিও তাঁর ভালভাবেই পড়া আছে — একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। অথচ অর্থমন্ত্রীর তুলনা থেকে দেখা গেল, স্থান-কাল পার্থক্যের কাণ্ডজ্ঞানটুকুও তাঁর নেই, এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির গোলামি করতে গিয়ে মার্কসের বক্তব্যকে তিনি ইচ্ছামতো বিকৃত করেছেন।

মার্কস যখন নিবন্ধটি লিখেছিলেন তখনও ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ তখনও সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পুরোপুরি প্রবেশ করেনি। মার্কসের এই লেখার কয়েক বছরের মধ্যেই, সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে মহারানি ভিক্টোরিয়া তথা ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে নেয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রেক্ষাপটটি মার্কস উক্ত নিবন্ধের ঠিক আগের অনুচ্ছেদেই সুস্পষ্টরূপেই তুলে ধরেছেন, ''ভারতের প্রগতিতে এতদিন পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীগুলির স্বার্থ ছিল অপ্রধান, পরিবর্তনশীল। শাসক শ্রেণীগুলির ছিল নিজ নিজ বিশেষ স্বার্থ। অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল এদেশ জয় করতে, ধনপতিরা চেয়েছিল লুণ্ঠন এবং মিলতন্ত্রীরা চেয়েছিল সস্তায় বেচে বাজার দখল। এখন দান উল্টে গেছে। মিলতন্ত্রীরা আবিষ্কার করেছে যে, উৎপাদনশীল দেশ রূপে ভারতের রূপান্তর তাদের কাছে একান্ত জরুরি এবং সেই জন্যে সর্বাগ্রে সেচ ও আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা তাকে দিতে হবে। এখন তাদের অভিপ্রায় ভারতের ওপর রেলওয়ের এক জাল বিস্তার করা এবং সে কাজ তারা করবেই এবং তার ফল অপরিমেয় হতে বাধ্য।'' মার্কসের রচনার অব্যবহিত পরেই ১৮৫৫ সালে ভারতে প্রথম রেলওয়ে স্থাপিত হয়। ভারতে রেলওয়ে স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও মার্কস উক্ত নিবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন, ''আমি জানি যে ইংরেজ মিলতন্ত্রীরা ভারতকে রেলপথে বিভূষিত করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ্য থেকে যাতে তাদের কলকারখানার জন্য কম দামে তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল লুঠ করা যায়।'' কোম্পানির শাসনের অবসানের পর ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী ব্রিটিশ সরকার ভারতের পঙ্গু উৎপাদনী শক্তিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে পরিকাঠামোর যতটুকু উন্নয়ন সেদিন ঘটিয়েছিল তার উদ্দেশ্য ভারতের জনগণের উন্নয়ন ঘটানো ছিল না, এমনকী ভারতীয় পুঁজির বিকাশ ঘটানোও তাদের লক্ষ্য ছিল না, ছিল একান্তভাবেই তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করা। এ প্রসঙ্গে উক্ত নিবন্ধেই মার্কস বলেছেন, ''খাস গ্রেট ব্রিটেনেই যতদিন না শিল্প-কারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটছে, অথবা হিন্দুরা (অর্থাৎ হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা — স.গ.) নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল যতদিন না একেবারে ঝেড়ে ফেলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এই সব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না।''

মার্কসের লেখার পর দেড়শ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। দেশে গঠিত হয়েছে একটি স্বাধীন পুঁজিবাদী সরকার এবং পুঁজিবাদ এদেশে শুধু পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র পর্যন্ত অর্জন করেছে। লেনিন

সাতের পাতায় দেখুন

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে টেক্সটাইল ক্ষেত্র

কোটা-উত্তর পর্বে দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান ও অর্থনৈতিক সংকট প্রসঙ্গে

বস্ত্র শিল্পজাত পণ্য বাণিজ্য ক্ষেত্রটি মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট (MFA) চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। ১৯৭৩ সাল থেকে এই নীতির কার্যকারিতা শুরু এবং শেষ হয়েছে ২০০৫ সালের ১লা জানুয়ারী। অন্তত চল্লিশটি দেশ এই ব্যবস্থার শরিক। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রিয়ার মত শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উন্নয়নশীল অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে-পড়া দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে বস্ত্রপণ্য আমদানির পরিমাণের ওপর কোটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। এদের বস্ত্রপণ্য সামগ্রীর রপ্তানীর নির্দিষ্ট পরিমাণ বা কোটা ছিল। মোটামুটি এটাই কোটা ব্যবস্থা বলে পরিচিত। কোটা চাপানোর পক্ষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকদের যুক্তি ছিল, উন্নয়নশীল দেশগুলি বস্ত্রশিল্পে ব্যাপকহারে সস্তা শ্রম নিয়োগ করে, শ্রমমান মেনে চলে না, যার দ্বারা তারা পণ্যের দাম কমিয়ে রেখে বাজারের বেশি অংশ দখলে নিতে চায়, যেটা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ঘটতে দিতে চায় না। এ নিয়ে ভারতের মতো তথাকথিত উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দর ও মন কষাকষি শুরু থেকেই ছিল। গ্যাটের আলোচনায় যখন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি 'ফ্রি-ট্রেড' বা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সওয়াল শুরু করল, তখন ভারত, ব্রাজিলের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলো, যারা আবার উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থে উন্নত, তারা উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতার স্থান নিয়ে দাবি তুলল, মুক্ত বাণিজ্যের কথা বললে বস্ত্রশিল্প পণ্যের আমদানির উপর কোটাও রদ করতে হবে। এ ব্যাপারে কিছুটা আপস করতে রাজি হয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। স্থির হয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ধাপে ধাপে তুলে দেওয়া হবে। তুলে দেওয়ার সময়সীমা ১০ বছর। সেই ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে ১লা জানুয়ারী ২০০৫। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি কেনই বা ছিল, তার দ্বারা কারই বা উপকার হয়েছে, মানে সুফল যদি কিছু হয়ে থাকে কে তা ভোগ করল, আর এই নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পর বস্ত্র-পোষাক ইত্যাদির বাণিজ্যটি সাধারণ বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর কারই বা লাভ হবে, ক্ষতিই বা কার — এই নিয়ে সংবাদপত্রে খুবই সোরগোল হয়। মন্ত্রীরাও নানারকম ভবিষ্যতবাণী শোনান। আমরা চেষ্টা করব এই সমস্যাগুলি বিচার করতে। দেখতে হবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই বা এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর আমেরিকান সাংবাদিক হাক গাটম্যান ইংরেজি দৈনিক দি স্টেটসম্যান ১৩ জানুয়ারি এক বিশেষ নিবন্ধে লেখেন, ''১৯৭৩ সালে রচিত একটি মাল্টিফাইবার চুক্তির মধ্য দিয়ে বস্ত্র আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, এর দ্বারা এই নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক উন্নয়নশীল দেশকে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই কোটা ব্যবস্থার ফলে প্রচুর নতুন চাকরি সৃষ্টিতে সক্ষম হয় উন্নয়নশীল দেশগুলি। এই কোটা ব্যবস্থাই ১লা জানুয়ারি শেষ হয়েছে।'' আমরা এই বক্তব্যটি বেছে নিলাম, কারণ এই ধারণাটি অনেকেই পোষণ করেন, যা আদপেই সত্যি নয়। এখানে প্রথম প্রশ্ন—''উন্নয়নশীল জাতিগুলির বা দেশের'' বলতে কী বোঝায়? দেশ বা জাতি বলতে কোন অখণ্ড সত্তা আজ বোঝায় না। দেশ বা জাতি আজ শ্রেণীবিভক্ত। পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী—মূলত এই দুই শ্রেণীতে দেশ ও জাতি বিভক্ত। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী। শাসিত শ্রমিকশ্রেণী — সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বাস্তব এই ইতিহাসের উপাদানকে মানতেই হবে। কোটা ব্যবস্থা বা 'মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট'-এর প্রবক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বলতে হয় শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী উৎপাদনের নতুন ক্ষেত্র হিসাবে এই বিশেষ ক্ষেত্র এবং তার পরিপূরক ক্ষেত্রগুলির বিকাশ ঘটিয়েছে এবং এর দ্বারা প্রচুর কর্ম সংস্থানও হয়েছে। মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট-এর এই বদান্যতার ব্যাখ্যা যথাযথ নয়।

ভারতের মোট রপ্তানীর ৩০ শতাংশ হল বস্ত্র-শিল্পজাত পোষাক পরিচ্ছদ রপ্তানী। এর মধ্যে cotton piece goods, knitted fabrics, made-ups, yarn প্রভৃতি রপ্তানীর পরিমাণ ৭৫%। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি এই পণ্যগুলির উপর নিয়ন্ত্রিত কোটা ধার্য করে রপ্তানীর পথে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল। এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সুতি বস্ত্রের ৫২% এবং তৈরি পোষাকের ৭৭% রপ্তানি হত। কোটার বাধা যেসব দেশে নেই সেইসব দেশে ঐগুলি যথাক্রমে ৪৮% এবং ২৩% রপ্তানী হত। এই দেশগুলিতে অবশ্য লোকসংখ্যা ও তাদের ক্রয়ক্ষমতাও কম। '৯১, '৯২, '৯৩-এ রপ্তানী বেড়েছিল ৯৫%। ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দাবি তুলেছিল, কোটা ব্যবস্থার দ্বারা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা তুলে দিয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলির বাজারে আরও ঢুকতে দিতে হবে। উল্লেখ করা দরকার, দীর্ঘ সময় ধরে ভারত সরকার ১৭টি বিদেশী বস্ত্রজাত পণ্যের আমদানির উপর ৮৫% কর ধার্য করে মার্কিন সহ নানা বিদেশী বস্ত্রপণ্যকে ভারতীয় বাজারে ঢোকার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। উন্নত দেশগুলি থেকে রপ্তানীর ক্ষেত্রে কোনো বাধা তো মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্টে ছিল না। ডাংকেল প্রস্তাবকে ভিত্তি করে উরুগুয়ে রাউণ্ডে টেক্সটাইল সেক্টরকে কীভাবে গ্যাট-এর নিয়মে আনা যায় তা নিয়ে চুক্তির অঙ্গ হিসাবে ১০ বছরের পদক্ষেপগুলি ঠিক হয়। প্রস্তাবে ছিল ঃ কোটা আরোপকারী শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ১৯৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে চারটি পর্যায়ে কোটা কমিয়ে কমিয়ে তুলে দেবে। প্রথম পর্যায়ে ১৯৯০ সালে তারা মোট আমদানির ১৬ শতাংশ পরিমাণ কোটা তুলে নেবে, তিন বছরের মাথায় আরও ১৭ শতাংশ, সাত বছরের মাথায় আরও ১৮ শতাংশ বাড়িয়ে বাকি ৪৯ শতাংশ ১০ বছরের মাথায় তুলে নেবে। কিন্তু আমেরিকা এই পর্যায়ক্রমে শতাংশের পরিমাণ নিজেদের ইচ্ছামত যথাক্রমে ৩%, ১২% ও ৩২% ও ৫৫% করে নেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্থির করে তারা যথাক্রমে ২.৪%, ৬.৯%, ১৫.৯৪% ও ১০ বছরের মাথায় বাকি ৭৬.৩% কোটা রদ করবে।

অর্থাৎ শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির এই প্রাধান্য — গ্যাট-এর যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং যা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে, — এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। ভারত সরকারকেও চুক্তি করতে হল যে, ১৭টি বস্ত্রজাত পণ্যের উপর যেভাবে ৮৫% শুল্ক বসিয়ে আভ্যন্তরীণ বাজারকে সংরক্ষিত করতে চাইছিল—সেখান থেকে তাকে সরে বাজার মুক্ত করতে হবে। এজন্য ৮৫ শতাংশ শুল্ক নামিয়ে আনতে হবে ৪০ শতাংশে। এটা করতে হবে ঐ ১০ বছর সময়সীমার মধ্যেই। (গ্যাট কি ও কেন, অন্যচোখে)

তথ্যের এই প্রেক্ষাপট থেকে বেরিয়ে আসছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা ঃ এক) শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির বাণিজ্যিক সুবিধার প্রাধান্য ; দুই) ভারতের মতো তথাকথিত উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশ ও শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়া পুঁজির তীব্র বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের উপর ঐক্যের ভিত্তিতে বাজারের বাঁটোয়ারা নির্ধারিত হচ্ছে পুঁজির ক্ষমতার অনুপাতে ; তিন) মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলা হলেও বাজার দেওয়ার বদলে বাজার নেওয়ার লগ্নীপুঁজির সাবেকী বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাটির ক্রিয়াশীলতা নগ্ন হচ্ছে। বলা ভাল, বাণিজ্য যুদ্ধ ও সন্ধির নয়া দলিলের অপর নাম গ্যাট বা WTO'র ম্যানেজমেন্ট।

কোটার সুফল কার ?

এখন প্রশ্ন হল, এদেশের রপ্তানীর ৯৫% বৃদ্ধির সুফল পেল কে? মুম্বাইয়ের মিল মালিকদের সংগঠনের চেয়ারম্যান মফৎলালের দাবি, উদারনীতির ফলেই টেক্সটাইল রপ্তানি লাফ দিয়ে বেড়েছে। এই স্বীকৃতি থেকে বোঝা গেল মিল মালিকদের লাভ হয়েছে। আর শ্রমিকরা কি পেল? ১৯৯২ সালে ছাঁটাই হয়েছে ৭৯ হাজার ৯৮২ জন, ১৯৯৩ জুলাই-এর মধ্যে ছাঁটাই ২৮ হাজার ৯৭০ জন, আরও ৫১ হাজার ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল তখনই। তাছাড়া মার্কিন পণ্য এই বিশেষ ক্ষেত্রে যে পরিমাণে ঢুকত, পরে শুল্ক বাধা অর্ধেকেরও কম হওয়ার জন্য অনেক বেশী পরিমাণে বর্তমানে ঢুকবে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাজার-সংকটের দরুণ শ্রমিকদের কর্মসংকোচন প্রক্রিয়ায় বাড়তি মাত্রা আনবে। কোটা বহির্ভূত দেশগুলির পণ্য ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজারে। বিভিন্ন সেক্টরে এমনটাই ঘটছে। বস্ত্রশিল্পে আরও বেশী হবে বর্তমানে। এইতো সেদিন ২৪ জানুয়ারী ৩০৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার সরাসরি বিদেশী লগ্নী অনুমোদন পেল ৩০টি প্রকল্পে। রসায়ন, কৃষি, টেলিকম, খনি, বিদ্যুৎ ও তথ্যপ্রযুক্তি সহ বস্ত্রশিল্পে এই লগ্নী খাটবে (গণশক্তি ২৫.১.০৫)। এমনিতেই রপ্তানীবৃদ্ধি কাজের (job) সুযোগ বাড়ানোর বদলে কমিয়েছে, আরও কমবে। দেশীয় বাজারে ও বাইরের দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধি তথা বাজার রাখতে বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন আরও সস্তা করতে হবে। সস্তা করতে হলে প্রযুক্তিগত উন্নতির দরকার হবে, যার পরিণতি হল শ্রমিক ছাঁটাই। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে কাজ পাওয়ার প্রতিযোগিতা বাড়বে, অর্থাৎ শ্রমিকের যোগান বাড়বে, চাহিদা কমবে—যার অনিবার্য পরিণতিও মজুরী হ্রাস। এদিক থেকেও শ্রমিকরা অনেক বেশী দুর্দশায় পড়বে। এই আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস সম্পর্কে স্বীকৃতি পাওয়া যায় সংবাদমাধ্যম সমীক্ষায়। বিজনেস উইক পত্রিকা বলেছে, কোটা ব্যবস্থার অবলুপ্তির অর্থ ৩ কোটি কাজ চলে যাওয়া। (গ্যাট কি ও কেন — পূর্বোক্ত)

শ্রমিকরা কোটা ব্যবস্থা থাকার সুবিধা তাহলে কি পেয়েছে? আর কোটা ব্যবস্থা উঠে গেলেই বা শ্রমিকরা কি সুবিধা পাবে? আসলে কোটা রাখা বা না-রাখার ব্যবস্থাটা কিন্তু শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে হয়নি। রপ্তানী বাণিজ্য নীতিটাও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে হয়নি। সমস্ত চুক্তি ও নিয়মাবলী একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থের বিনিময় হিসাবেই হয়েছে। ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশে একচেটিয়া পুঁজির লাভ এই মাল্টিফাইবার চুক্তি দ্বারা হলেও, শ্রমিকদের দুর্দশা বঞ্চনা যেমন বেড়েছে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশের যারা কোটার সুবিধা ভোগ করত—সেই 'ভোগ' (!) শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে দুর্ভোগই এনেছে। খোদ আমেরিকার কি হাল দেখা যাক ঃ In the USA's largest textile producing state, North Carolina, 1,60,900 jobs were lost in the last decade : [The Statesman 13.1.05] অবশিষ্ট কর্মরতদের জন্য আগামীদিনেই বা কী সৌভাগ্য অপেক্ষা করে আছে দেখা যাক ঃ ''..... 1,00,000 remain, and between a quarter and a half of them will be gone in next four years. Overall one-third of the 6,75,000 textile/apparel jobs which remain in the USA are at risk.'' [The Statesman 13.1.05] আমেরিকার ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার শ্রমিকের অর্ধেকের ভাগ্যেই বেকারত্ব অপেক্ষা করে আছে!

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের মত তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশে এবং আমেরিকার মত উন্নত দেশে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের ভাগ্য, MFA থাকার দ্বারা, রপ্তানী বাণিজ্যের বৃদ্ধির দ্বারা, লাভবান হয়নি। তারা হারিয়েছে কাজ। কমেছে মজুরী ও নিরাপত্তা। দারিদ্র্য বেড়েছে। অন্যান্য ছোট দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রেও একই ছবি পাওয়া যাবে। কোটা ব্যবস্থা না থাকার দরুণও শ্রমিকের জীবনে কর্মহীনতা কোথাও কমবে না, বরং বাড়বে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত গতিতে বাড়ছিল, বাড়বে। মুনাফার পরিমাণ ও হারের কমবেশী যা কিছু তা নির্ধারিত হবে বাণিজ্য যুদ্ধের, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের লড়াইয়ের পরিণতিতে। এই যুদ্ধ যত তীব্র হবে, শ্রমিকের উপর শোষণ তত নগ্ন, বেপরোয়া হয়ে উঠবে। হচ্ছেও তাই।

চীনা উন্নয়নের মডেল — কোন মডেল ?

চীনকে দেখা যাক। আধুনিক বিশ্বে চীনকে ''উন্নয়নের প্রতীক'' হিসাবে তুলে ধরছে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নেতারা। লক্ষণীয় যে, যতদিন চীন সমাজতান্ত্রিক ছিল, বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্রনায়করা কুৎসার বন্যা বইয়ে দিতেন চীন সম্পর্কে। আজ চীনে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে। প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীন পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। এখন কিন্তু তাবড় তাবড় সাম্রাজ্যবাদী নায়করা, নামজাদা একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ''চীনের সমাজতন্ত্রে'র নয়া মডেল''-এর গুণকীর্ত্তন করে বলছেন কীভাবে তারা উদার অর্থনীতিতে নিজেকে জড়িত করে লাভবান হচ্ছে, কী প্রচণ্ড উন্নয়ন ঘটছে সেখানে ! দেখা যাক বাস্তবটা কি? খেলার পোষাকের ও জুতো তৈরির দৈত্যাকার কোম্পানি NIKE'র নাম সবাই জানেন। চীনের শ্রমিকদের এজেন্সী মারফৎ কাজ করিয়ে সে তার পণ্য বাজারে ছাড়ে। আমেরিকার ন্যাশানাল লেবার কমিটি এক সমীক্ষায় বলছে, নাইকে কোম্পানির যেসব জুতো (নিকারস) চীনের মহিলারা ঘন্টায় ২০ সেন্টস্ মজুরিতে তৈরি করে, সেটা আমেরিকায় পৌছালে তার সম্পূর্ণ আমদানি মূল্য দাঁড়ায় ১৪.৬১ ডলার। কাঁচামাল, শ্রমিকের মজুরি, জাহাজ পরিবহনের খরচ, নাইকের চীনা ঠিকাদারদের মুনাফা সবকিছু যুক্ত করেই মূল্য দাঁড়ায় ১৪.৬১ ডলার। সেই জুতো বাজারে বিক্রি করে ১৩৫ ডলারে, অর্থাৎ ৯২৪ শতাংশ মুনাফায়। [The Statesman ১৩.১.০৫] যাবতীয় খরচ জুগিয়ে, চীনা ঠিকাদারের লাভ জুগিয়ে ১৪.৬১ ডলার খরচ করে সেই মাল বিক্রী হচ্ছে ১৩৫ ডলার দামে। লাভের বহর ৯২৪ শতাংশ, শ্রমিকরা পাচ্ছে উচ্ছিষ্ট। মনে রাখতে হবে, চীনা ঠিকাদারদের পাওনাও উল্লেখযোগ্য। কারণ ''it has been the driving force of new wealth in China.'' [The Statesman ১৩.১.০৫], অর্থাৎ এখন ঠিকাদারদের ও পুঁজিপতিদের মুনাফা এবং সম্পদই ''চীনের সম্পদ''। ঠিক যেমন Nike-এর লাভ এবং সম্পদবৃদ্ধিই আমেরিকার সম্পদবৃদ্ধি ও লাভ। যেসব চীনা পুঁজিপতিরা চীনের বাইরে থাকে, ''চীনে মোট নিযুক্ত লগ্নীপুঁজির ৬৫% তাদেরই প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ। প্রত্যক্ষ বিদেশী লগ্নীর মোট পরিমাণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

পুত্রহারা মা শিহানকে ঘিরে আমেরিকায় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে নতুন জোয়ার

যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের ধাক্কায় রাষ্ট্রপতি বুশের অবস্থা সত্যিই জেরবার। এমনকী তাঁর নিরুপদ্রব গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলিও তিক্ত বিষময় হয়ে উঠেছে দেশে বিদেশে ক্রমাগত আছড়ে পড়তে থাকা এই আন্দোলনের প্রবল ঢেউয়ে। এক তো ইরাকে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হাতে বিপর্যস্ত বিশ্ববিশ্রুত মার্কিন বাহিনীর আজ এমন দশা যে, বাগদাদের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত গ্রিন জোনের নিরাপত্তাটুকু রক্ষা করতেই তাদের হিমসিম খাবার যোগাড়। তার উপর আবার এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন।

'ক্যাম্প কেসি' হল এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনেরই এক নবতম সংযোজন, যার প্রভাব আজ আর শুধু আমেরিকায় নয়, বিশ্বজুড়েই অনুভূত হচ্ছে। যাঁর নামে এই নাম, সেই কেসি শিহান ছিলেন ইরাকের মাটিতে মার্কিন দখলদার বাহিনীর এক সাধারণ সৈন্য। ইরাকের মাটিতে পা রাখার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল বাগদাদের সদর সিটিতে ইরাকি প্রতিরোধকারীদের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তবে তাঁর মা সিন্ডি শিহান তাতে ভেঙে পড়েননি। পুত্রহারা জননীর শোক চোখের জল ছাপিয়ে রূপ নিল এক বৃহত্তর আন্দোলনের অঙ্গীকারে। ইরাকে তাঁর সন্তানের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই একইভাবে ইরাকের মাটিতে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে গিয়ে মৃত অন্যান্য সৈন্যদের মায়েদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তৈরি হল 'গোল্ডস্টার মাদার্স ফর পিস', যার অন্যতম সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাত্রী তিনি নিজেই।

পুত্রহারা মায়েদের এই সংগঠনের প্রধান দাবি হল, 'ভয়াবহ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ইরাকের যুদ্ধ এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে এবং সেখান থেকে আমাদের সমস্ত ছেলে ও মেয়েদের ফিরিয়ে আনতে

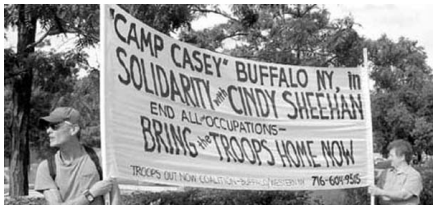

হবে।' এই দাবি নিয়েই সিন্ডি শিহান আগস্ট মাসের শুরু থেকেই টেক্সাসের ক্রফোর্ডে রাষ্ট্রপতি বুশের ১৬০০ একরব্যাপী সুবিস্তীর্ণ গ্রীষ্মাবাসের সামনে অবস্থান শুরু করেন। দাবি, বুশকে এখনই তাঁর সাথে দেখা করতে হবে এবং এই অন্যায় যুদ্ধ, যা কেড়ে নিয়েছে তাঁর পুত্রের মত অসংখ্য সাধারণ মানুষের প্রাণ, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। নাহলে সারা আগস্ট মাস, বুশের গ্রীষ্মাবকাশের শেষ পর্যন্ত তিনি বুশের দরজায় ঐ রাস্তায় পাশের ক্যাম্পেই অবস্থান করবেন। শুধু তাই নয়, ছুটি শেষে বুশ ওয়াশিংটনে ফিরে গেলে, তিনিও তাঁকে সেখানে অনুসরণ করবেন ও সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন।

একমাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করেই তাঁর এই অবস্থান বিক্ষোভ থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা সম্ভব।

'ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য ফেরাও' এই নামে যে মঞ্চটি আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী নানা সংগঠন যৌথভাবে গঠন করেছে, তারা সিন্ডি শিহান-এর দাবির সমর্থনে গোটা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। 'ক্যাম্প কেসি' আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে আমেরিকার নানা শহরে আগস্ট মাস জুড়ে সংহতি সমাবেশ হয়েছে। গত ১৫ আগস্ট নিউ ইয়র্কের ইউনিয়ন স্কোয়ার পার্কে এমনই একটি হঠাৎ ডাকা সমাবেশে শত শত মানুষ জড়ো হয়ে যান। ক্রফোর্ডে সিন্ডি শিহান যেমন তাঁবু করে দিন কাটাচ্ছেন, অনুরূপ একটি তাঁবু তৈরি করা হয়েছিল আন্দোলনের 'প্রতীক' রূপে। দু'দিন সংগঠকরা ঐ পার্কে অবস্থান করেন। বক্তারা বলেন, ইরাকে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবিতে 'সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মে' বাধা সৃষ্টি করার যেকোনরকম পন্থা আমাদের নিতে হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে বিশাল যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে সকলকে যোগ দিতে তাঁরা আহ্বান জানান।

ফিলাডেলফিয়াতেও অনুরূপ 'ক্যাম্প কেসি' বিক্ষোভ হয়েছে। সেখানেও অপর এক সন্তানহারা পিতা মাইকেল বার্গ বলেছেন, 'শিহান যে সাহস দেখিয়েছেন, আমাদের সকলের কাছেই তা শিক্ষণীয়। আমি জেলে গেলে যদি আমার সন্তান ফিরে আসে, তবে আমি তাতেও রাজী।' ঐ সমাবেশের পোস্টারে লেখা ছিল — ১,০০,০০০ ইরাকি, ১৮০০ মার্কিন সৈন্য এবং সত্য — এরা সকলেই বুশের ইরাক যুদ্ধে নিহত হয়েছে।''

যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের ধাক্কায় লা ভেগাসে একটি 'সেনা রিক্রুটিং কেন্দ্র' বন্ধ করে দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়।

ক্যাম্প কেসি'র প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে বসটন, ডেট্রয়েট, মিয়ামি, সান ফ্রান্সিসকো, আটলান্টা, পোর্টল্যান্ড, কানসাস সিটি সহ অসংখ্য শহরে।

মা শিহান-এর সমর্থনে ২৪ সেপ্টেম্বর লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হবে ওয়াশিংটনে।

লাদেন, ওমরকে কাছে পেয়েও মার্কিন শাসকরা ধরতে চায়নি

২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক আক্রমণের উদ্দেশ্য যে আদৌ সন্ত্রাসবাদ দমন ছিল না, একথা তখনই উঠেছিল এবং যতদিন গেছে, ততই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। বস্তুত মৌলবাদী আলকায়দা-তালিবানদের দমন করা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল না — সম্প্রতি এক প্রাক্তন সিআইএ গোয়েন্দার স্বীকারোক্তি থেকেও সেই তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। একথা জানা আছে যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েট প্রভাব ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের দাঁড় করিয়েছিল। এদের ব্যবহার করেই ১৯৮৯ সালে আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিয়েছিল, হত্যা করেছিল প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাকে, কায়েম করেছিল তালিবানি শাসন। পরে এই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীরাই যখন লুঠের বখরা মার্কিন শাসকদের দিতে চাইল না এবং আফগানিস্তানে পুরোপুরি মার্কিন কব্জা কায়েমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, তখন সেই মার্কিন শাসকরাই আফগানিস্তানকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি বলে অভিযোগ তুলে, দোসর ব্রিটিশ শাসকদের সাথে নিয়ে আফগানিস্তানে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়েছে। হাজার হাজার মার্কিন সৈন্য পরিবেষ্টিত তাঁবেদার সরকারকে দিয়ে মার্কিন শাসকরা আফগান ভূখণ্ডের উপর সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। অথচ সেই সন্ত্রাসবাদীরা শেষ হয়েছে কি? ঘটনা বলছে, সন্ত্রাসবাদ দমন হওয়া দূরের কথা, কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী পাণ্ডাদের একজনকেও ধরা পর্যন্ত হয়নি, যদিও তাদের ধরার নামেই হাজার হাজার অসহায় আফগান নরনারী ও শিশুকে বোমা মেরে হত্যা করা হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, হিংস্র সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম আঞ্চলিক যুদ্ধ সর্দার (ওয়ারলর্ড) ইসমাইল খাঁ ও আবদুল রসিদ দোস্তুম পুতুল কারজাই সরকারের যথাক্রমে শক্তিমন্ত্রী ও সামরিক প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করে আছে। শুধু কি তাই? প্রধান যে দু'জন সন্ত্রাসবাদী পাণ্ডা ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরকে ধরার কথা বলে আমেরিকা অভিযান চালাল, তাদের কী হল? তারা কেন ধরা পড়ল না? এই প্রশ্নের জবাব মার্কিন শাসকরা দিতে পারবে কি? আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনী সিআইএ'র নিজস্ব ঝটিকা বাহিনী 'জব্রেকা'র অবসরপ্রাপ্ত ফিল্ড কমান্ডার গ্যারি বার্নটসেন তাঁর লেখা 'জব্রেকা' নামের বইয়ে এ ব্যাপারে যে তথ্য ফাঁস করেছেন, তা মার্কিন অভিসন্ধি সম্পর্কে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনমতকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

কর্মজীবনে মার্কিন শাসকদের নির্দেশে যে অপকর্ম তাঁকে করতে হয়েছে, বোধহয় তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই বার্নটসেন মার্কিন শাসকদের চক্রান্ত, তাদের ষড়যন্ত্রমূলক চিত্র তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, সন্ত্রাসবাদী নেতা ওসামা বিন লাদেনকে মুঠোয় পেয়েও তাকে ধরার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। বস্তুত, আফগানিস্তানের পাহাড় গুহা তোরাবোরায় অবরুদ্ধ কয়েকশ' তালিবান ও আলকায়দা নেতাদের মধ্যে লাদেন ছিল। মার্কিন সরকার তাদের পালিয়ে যেতেই খোলাখুলিভাবে সাহায্য করেছে। কারণ, লাদেন সহ আলকায়দা ও তালিবান সন্ত্রাসবাদীদের ধরার জন্য বার্নটসেনের নেতৃত্বে সিআইএ অফিসারদের যে সৈন্য দরকার ছিল, তা মজুত থাকা সত্ত্বেও ঐ অফিসারদের শত অনুরোধেও তাদের পাঠানো হয়নি। ফলে সহজেই ঐ সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যেতে পেরেছিল। আসলে তাদের পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল। (সূত্র ঃ হিন্দুস্তান টাইমস ৯-৮-০৫) এরপর তারা মিথ্যা গল্প সাজিয়েছে। যেমন জর্জ বুশ তাঁর প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচনের ভাষণে বলেছিলেন, ''পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন তোরাবোরার পাহাড়ি ডেরায় লাদেন আদৌ ছিল না।'' ২০০১ সালের ১৯ অক্টোবর প্রাক্তন সেন্টকম কমান্ডার জেনারেল টমি ফ্রাঙ্ক আবার আরো একধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, ''বিন লাদেন কখনই আমাদের মুঠোয় ছিল না।'' অবসরের পর বুশ প্রশাসনের কাছ থেকে কোন উচ্চপদে চাকরির নজরানা পাওয়ার আশায় একথা টমি ফ্রাঙ্ককে বলতে হয়েছিল। বস্তুত এটাই ঘটেছে। অবসরের পর টমি ফ্রাঙ্ক সরকারি উচ্চপদের পুরস্কার পেয়েছিলেন। বার্নটসেনের আগে সিআইএ'রই আরো এক প্রাক্তন অফিসার গ্যারি স্ক্রুয়েন খোলাখুলি বলেছিলেন যে, বিন লাদেনকে 'খুঁজে না পাওয়ার' কারণ হল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও আইএসআই তাকে আগলে রেখেছিল। কোন্ পাকিস্তান? যে পাকিস্তান মার্কিন শাসকদের ঘনিষ্ঠ মিত্র — সন্ত্রাসবাদ দমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একনিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ মিত্রশক্তি।

আমরা সকলেই জানি, পাকিস্তানের শাসকদের এমন ক্ষমতা নেই যে, তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমকে অগ্রাহ্য করে। অর্থাৎ, মার্কিন শাসকরা যদি সত্যই লাদেন ও ওমরকে ধরতে চাইত, তবে পাকিস্তানের সাধ্য নেই তাদের লুকিয়ে ও আগলে রাখে। এজন্যই একটা কথা চালু আছে — 'বিন লাদেন কোথায়? হোয়াইট হাউস যেথায়।' অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সুরক্ষার ছত্রছায়াতেই তারা নিরাপদে আছে এবং যখন প্রয়োজন তখনই তাকে টিভির পর্দায় হাজির করা হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং টেক্সটাইল ক্ষেত্র

চারের পাতার পর

১০,৯৬৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই লগ্নীপুঁজির ৬০% উৎপাদন ক্ষেত্রে, ২৪% রিয়াল এস্টেটে, ১৬% পরিবহনে, পাইকারী ব্যবসা ও খুচরো ব্যবসায় নিযুক্ত!'' (প্রতিদিন, বিশেষ নিবন্ধ, ২১.১.০৫) চীনের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে আজ এই লগ্নীপুঁজির ফাঁস। চীনের নবউত্থিত পুঁজিপতিদের স্বার্থে ও তাদের সাথে যুক্তভাবেও এই পুঁজিই শ্রমিক চাষী সহ সর্বস্তরের জনগণকে লুণ্ঠন করছে। জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে চরম সংকট, বেকারি, অনিশ্চয়তাই বর্তমান অর্থনৈতিক সংস্কার ডেকে এনেছে। ''১৯৭৮ সালে চীনে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজ করতেন ৭৫ লক্ষ কর্মী, কর্মী সমবায়গুলোতে আরও ২০ লক্ষ। মোট ৯৫ লক্ষ। ১৯৯৫-এ তা বেড়ে হয় ১ কোটি ১৩ লক্ষ, সমবায়ে আরও ৩১ লক্ষ। মোট ১ কোটি ৪৪ লক্ষ। ২০০১ সালে এই মোট সংখ্যা কমে হয় ৮৯ লক্ষ। ছাঁটাই ৬ বছরে ৫৫ লক্ষ'' (প্রতিদিন-ঐ)। বেসরকারী ও সরকারি যৌথ উদ্যোগে ঐ সময়ে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোক শহরাঞ্চলে কাজ পেলেও ততক্ষণে গ্রামীণ বিরাট উদ্বৃত্ত শ্রমের হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে, যার হিসেব কেউ দেয় না (প্রতিদিন-ঐ)। রাষ্ট্রীয় খামারের পাশে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কৃষকদের ফসল কিনে নেওয়ার রাষ্ট্রীয় বাধ্যতা ক্রমশ বাতিল হওয়ায় বাজার অর্থনীতিতে পণ্যের যে সমস্যা হয় তাই ঘটছে। ফিরে আসছে খণ্ড খণ্ড ছোট জমি। উৎপাদনের হার হ্রাস পাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় খামারগুলির ভূমিকা পুঁজিবাদে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শোষণযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট মজুরি ও সুরক্ষা ব্যবস্থার বদলে চালু হয়েছে ঠিকা প্রথার ঘৃণিত রেওয়াজ। মাও পরবর্তী চীনে ক্রমান্বয়ে বিশেষত ১৯৯০ থেকে সংস্কার কর্মসূচি জোরকদমে দেশকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছে যে, আজ ১৫ কোটি বেকার, বাস করে দারিদ্র্যসীমার নীচে। গ্রাম ও শহরের আয়ের পার্থক্যও হু হু করে বাড়ছে। শ্রমিকদের সুরক্ষার দায়, পেনসন ইত্যাদির পাট চুকিয়ে দিচ্ছে তারা। WTO'র চুক্তি অনুযায়ী ২০০৭ সালে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রও বিদেশী পুঁজির জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। দেশের মানুষকে নিরন্ন, বেকার রেখে, বর্বরভাবে শ্রমিক-কৃষকের রক্ত শোষণ করে চীন আজ বিশ্বে তৃতীয় শক্তিধর দেশ! শুধু ২০০৪-এ চীনের বিদেশী বাণিজ্য ছিল ১.১৫ ট্রিলিয়ন ডলার। সমীক্ষায় প্রকাশ, এফ.এম.সি.জি.'র ক্ষেত্রে চীনের প্রবৃদ্ধি ১১%, যা ভারতের ২%। নতুন পুঁজিপতিদের উন্নয়নই আজ চীনের উন্নয়ন ! চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ! তাই চীনা ডেনভার সংস্থা আই বি এমের মতো কোম্পানীর ৫০% কিনে নেওয়ার গৌরবে সকলে হাততালি দিচ্ছে! চীনের শ্রমিকরা তথা জনগণ লগ্নীপুঁজির কী নির্মম শোষণের শিকার হচ্ছে বস্ত্রশিল্প ও জুতো শিল্পে NIKE'র ভূমিকা তারই নির্মম উদাহরণ। সমাজতন্ত্রের দৌলতে দেশের মানুষের গড়ে ওঠা ক্রয়ক্ষমতা, স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন-জীবিকার সুরক্ষা ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। (তথ্যসূত্র ঃ প্রতিদিন, ঐ)।

১৯৯৪-এ পিপলস ব্যাঙ্ক অব চায়না'র একটা সমীক্ষা দেখিয়েছে, সমীক্ষাভুক্ত ৫০ হাজার রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে সংস্কারের ফলে ৫ শতাংশের রাষ্ট্রীয় মূলধন বেড়েছে, ৬২ শতাংশের কমেছে, ২৩ শতাংশ পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। চীনে দু'দশকে বিদেশী পুঁজি বেড়েছে ৫০ গুণের বেশী। ১৯৮৫তে ছিল ১০০০ কোটি ডলার, ২০০২-এ ৫৩ হাজার কোটি ডলার। ১৯৯০-এ ম্যানুফাকচারিং পণ্যের মোট বিক্রীর ২.৩ শতাংশ ছিল বিদেশী পুঁজিভিত্তিক শিল্পের, এখন তা ৩১.৩ শতাংশ। মোট জাতীয় উৎপাদনের রপ্তানীর অংশ ১৯৯০-এ ছিল ১৬ শতাংশ, ২০০২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৬ শতাংশ। আর রপ্তানীর অর্ধেকই হচ্ছে বিদেশী পুঁজির শিল্পে। (অনীক, ফেব্রুয়ারি'০৫)।

সন্দেহ নেই IMF এবং World Bank'র আকাঙ্খিত রপ্তানিকেন্দ্রিক এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মডেল হিসাবে চীন গড়ে উঠছে। মাও পরবর্তী দেং-এর যুগে চীনের ছবি অতীতের সাথে একটু তুলনা করলেই অগ্রগতির কঙ্কালটা বেরিয়ে আসবে। প্রাক-১৯৭৬ পর্বে চীনে কোন বৈদেশিক ঋণ ছিল না, বা বাণিজ্য ঘাটতি ছিল না। আর দেখুন, ১৯৮৫-৮৬ সালে বাণিজ্য ঘাটতি ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার কোটি ডলার। মুদ্রাস্ফীতির হার ১৯৮৮-৮৯ সালে ১৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৮৮তে বাজেট ঘাটতি ৯ হাজার কোটি ডলার। এই সময় ('৮৫-'৮৮) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ, আর ১৯৮৯-৯১ সালে তা নেমে আসে ২ শতাংশে। গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হারও কমে আসে। কমে যায় গ্রামীণ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার। শ্রমিকের প্রকৃত আয় কমে যায় ২১ শতাংশ। এরই নাম দেং-এর নেতৃত্বে উন্নয়ন! এরই নাম সংস্কার। ধন্য চীনা মডেল! (সূত্র ঃ ঐ)

''সরকারি হিসাবেই আয় বৈষম্যে চীন ছাড়িয়ে গেছে ভারত, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়াকে। দেশের রপ্তানী অর্থনীতির ২৬ শতাংশ হলেও তা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ৭৪ শতাংশ কব্জা করে আছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কিছু অধিক হলেও সরকারি ঋণের আধিক্য নতুন নতুন সংকট ডেকে আনছে। জাতীয় ঋণের পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪৫% অতিক্রম করেছে।'' মজার ব্যাপার, চীনকে রপ্তানীর চেয়ে আমদানীই বেশী করতে হয়। অবশ্য তা নিয়ে হৈচৈ করা হয় না। চীন সম্পর্কে গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে ঃ .... financial system crisis in China will be induced by a banking failure .... শুধু তাই নয়, Net present value of foreign debt is more than 13 percent of GDP in China.'' [Economic & Political Weekly 5.3.05] একদিন এই চীন কোথায় ছিল? ১৯৬৬-৭৪ সময়টাতে মোট জাতীয় উৎপাদন মূল্য বেড়েছিল ১১৬ শতাংশ, আর মোট শিল্প উৎপাদন মূল্য ১৩১ শতাংশ বেড়েছিল। (পিকিং রিভিউ, ১৯৮১, সংখ্যা ৩২) এর মানে হল, গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৪.১৩, ১৪.৫ শতাংশ। বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছিলেন, ১৯৫২-৭৬ পর্বে চীনে শিল্প উৎপাদন বেড়েছিল ১১.২ শতাংশ হারে। [Martin Hart Landsberg & Paul Burket]। ২০০৭ সালে মাও পরবর্তী চীনা নেতাদের দাবি — চীনে ১৯৬৬-৭৬ সময়ে মাও নেতৃত্বের ভুলের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছিল সামান্য! এই দাবী কি মিথ্যাচার নয়? অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় চীনের আপেক্ষিক অবস্থান মাও-এর সময়ে দেখা যাক ঃ ১৯৫২তে কৃষি উৎপাদন সূচক ১০০ ধরলে ১৯৭৯তে সূচকটি হয় ২৪৯, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৬৬, বৃটেনে ১৮৪, ফ্রান্সে ২০০ এবং জাপানে ১৬৪। অনুরূপভাবে শিল্প উৎপাদনে সূচক দেখুন — ১৯৭৯-ত চীনের সূচক ১৭৩৪, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৯০, বৃটেনে ২০২, ফ্রান্সে ৩৮৫, জাপানে ১৬২২। (সূত্র ঃ পিকিং রিভিউ ১৯৮১ সংখ্যা ৪০) রপ্তানিনির্ভর অর্থনৈতিক মডেলের অনিবার্য পরিণামে, সংবাদে প্রকাশ, সাম্রাজ্যবাদী চাপে চীনকে মুদ্রার (ইউয়ান) অবমূল্যায়নও করতে হয়েছে, যাতে বিদেশের বাজারে চীনের পণ্যের দাম বেশি হয়ে যায়।

সংস্কার প্রক্রিয়া একদা যথার্থ উন্নয়নশীল সমাজতান্ত্রিক চীনকে প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে অধঃপতিত করেছে সংকটজর্জরিত এক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ঘৃণ্য মডেলে।

পুঁজিবাদী চীনা ড্রাগনের জন্ম—চীনা শ্রমিকের রক্ত পান করে

সন্দেহ নেই, ক্রমবর্ধমান মন্দা, বাজার সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির সমস্যায় জর্জরিত বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পুঁজিবাদী চীন আজ নিজেকে শৃঙ্খলিত করে ফেলেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিরসনীয় সংকটের আবর্তে রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজ সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি আজ সেখানে ফুটে উঠছে। সুতরাং কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, চীনে ১৯৯০-এ ১০৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০০৩ এ ১৬৯ বিলিয়ন ডলার টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানীর খেসারত দিতে হয়েছে গ্রামের কৃষিক্ষেত্র, কৃষিশিল্প ও শহরের সংগঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্র থেকে ছিন্নমূল কাজ হারানো লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-চাষীকে, অর্থাৎ একটু রোজগারের আশায় কাজের বাজারে ভীড় করা অতি সস্তা মজুরী-শ্রমের বিপুল বাহিনীকে। কোটি কোটি বেকারের, নির্যাতিত, অভুক্ত, অর্ধভুক্ত মানুষের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস রয়েছে এই উন্নয়নের পিছনে! বিশ্ব বাজারে টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানী ১৯৯০-এ ৭ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশে (২০০৩) উলম্ফনের পিছনে রয়েছে ইতিহাসের এই ট্রাজেডি। আগামীদিনে বস্ত্র বাণিজ্যে বিশ্ব বাজারে যে ''চীনা ড্রাগনের'' আশঙ্কায় ভারত সহ নানা দেশ মাজা শক্ত করতে চাইছে, যদি সেই ড্রাগন সত্যিই জন্ম নেয়—তবে তার পুষ্টির জন্য কোটি কোটি চীনা মজুরের টাটকা রক্ত নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে! (ক্রমশ)

মনীষী চর্চার কেন্দ্র থেকে মদের লাইসেন্স বিতরণ

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর হল, তমলুকের ঋষি অরবিন্দের নামাঙ্কিত ঋষিধাম, হাওড়ার শরৎসদন, বাঁকুড়ার রবীন্দ্রভবন এবং বহরমপুরের রবীন্দ্রসদনে গত আগস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে মদের দোকানের লাইসেন্স বন্টনের জন্য লটারির ব্যবস্থা করে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। যা হওয়া উচিত ছিল মনীষা চর্চার কেন্দ্র, আজ সেখানে চলছে মদের লাইসেন্সের ফোয়ারা। একদিন মাদকদ্রব্য বিরোধিতা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি। আর ব্রিটিশ শাসকরা ছিল মাদকের পক্ষে। আজ ব্রিটিশরা এদেশের শাসনক্ষমতায় নেই, আজ ক্ষমতায় আসীন এদেশের শাসকগোষ্ঠী। তাই আজকের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর কাছে আন্দোলনের প্রাণসত্তা মারার জন্যই মাদক প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। এ কাজে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তথাকথিত বামপন্থী নামধারী সিপিএম বুর্জোয়া দলগুলিকেও ছাড়িয়ে গেছে। তারা গ্রামাঞ্চলে ১৮ হাজার মানুষ প্রতি একটি এবং শহরে ১২ হাজার মানুষ প্রতি একটি মদের দোকানের লাইসেন্স দিচ্ছে। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। লাইসেন্স দিয়ে শুধু টাকা সংগ্রহ বা ট্যাক্স কালেকশনই নয় যুবসমাজের নৈতিকতার মান ধসিয়ে দেওয়াই এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। 'মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে' — বলেছিলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। এই শাসকদের দিকে তাকিয়ে নজরুল লিখেছিলেন, 'ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কি খেলায় হাড়ে, মানুষে না মেরে প্রথমে ইহারা মনুষ্যত্ব মারে।' এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, 'একটা জাতি না খেতে পেলেও লড়ে, উঠে দাঁড়ায়, যদি তার নৈতিক বল অটুট থাকে।' শাসকশ্রেণী আজ এই জায়গায়ই আঘাত হানছে।

মদের লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস আন্দোলনে নেমেছে। গত ২৪ আগস্ট ডি এম অফিসে ডেপুটেশনের পর তমলুক হাসপাতাল মোড়ে পথ অবরোধ হয়। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন কমরেডস্ অনিতা মাইতি, বেলা পাঁজা, রীতা ওঝা, লক্ষ্মী দাস, অসীমা পাহাড়ী, পুতুল মাইতি প্রমুখ।

বহরমপুরে ২৬ আগস্ট উক্ত তিন সংগঠনের উদ্যোগে আবগারি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা পূর্ণিমা কর্মকার, স্নিগ্ধা সেন, এ আই ডি এস ও'র পক্ষে আবুল খয়ের, এ আই ডি ওয়াই ও'র জেলা সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে সামসুল আলম ও কৌশিক চ্যাটার্জী। বাঁকুড়ায় উক্ত সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ হবে আঁচ করে স্থান পরিবর্তন করে প্রশাসনিক ভবনে লটারির কাজ নিয়ে গেলেও সেখানেও নিস্তার মেলেনি। দীর্ঘক্ষণ সেখানে বিক্ষোভ চলে। জনগণের প্রতিবাদের প্রতি কোন মূল্য না দিয়ে লটারি চালিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে মাচানতলা পাঁচ মাথার মোড়ে এক ঘণ্টা পথ অবরোধ চলে।

এদিকে কলকাতার কালীঘাটে মহিম হালদার স্ট্রীটে পাড়ার মধ্যে দেশি মদের দোকান বন্ধের দাবিতে ২৮ দিন ধরে নাগরিক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। এই আন্দোলনে স্থানীয় মহিলারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

কালীঘাটে মহিম হালদার স্ট্রীটে মদের দোকান বন্ধের দাবিতে স্থানীয় মহিলাদের অবস্থান

ছাত্র ও শিক্ষাস্বার্থে লড়ছে এ আই ডি এস ও

একের পাতার পর

বিধ্বস্ত মালদা-মুর্শিদাবাদ থেকে, এসেছিল মেদিনীপুর ও কলকাতার স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কয়েকটি ট্রেন সাড়ে তিন ঘণ্টা-চার ঘণ্টা বিলম্ব থাকায় মিছিল শুরু করতে একটু দেরি হয়ে যায়। বেলা আড়াইটায় যখন মিছিল শুরু হয় তখন কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল প্রতিবাদী ছাত্রদের দৃপ্ত স্লোগানে মুখরিত। মিছিল শুরু হবার আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে চলছিল রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা। এই সভায় সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায় শিক্ষার সর্বাত্মক বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে বেগবান করার আহ্বান জানান। রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল শিক্ষার মূল সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে এস এফ আই, ছাত্রপরিষদ ও তৃণমূল ছাত্রপরিষদ পরিচালিত ছাত্রসংসদগুলির নিষ্ক্রিয়তার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা ছাত্র সংসদের কয়েক লক্ষ টাকার মধুভাণ্ড নিয়েই পড়ে আছে। অন্যদিকে ডিএসও'র আন্দোলনের ফলে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ শতাংশ আসনবৃদ্ধি হয়েছে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার অবসান ঘটেছে, ফর্মের দাম হ্রাস, ডোনেশন কমানো বা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এই সভায় মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত সুপ্রিমকোর্টের সাম্প্রতিক রায়, তফসিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চনা, র‍্যাগিং এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স প্রদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর মিছিল নির্মলচন্দ্র স্ট্রীট ধরে এসে পৌঁছায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে — যেখানে ১৯৫৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হাজার হাজার ছাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিলে সমবেত হয়েছিল।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস সরকারের পুঁজিপতিঘেঁষা খাদ্যনীতি, খাদ্যশস্যের ব্যাপক চোরাচালান ও তারই পরিণামে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট গ্রাম বাংলা থেকে হাজার হাজার বুভুক্ষু মানুষ খাদ্যের দাবিতে রাজভবনের দিকে যাচ্ছিল। কংগ্রেস সরকারের পুলিশ লাঠিগুলি টিয়ারগ্যাস চালিয়ে সরকারি হিসাবে ৮০ জন, বেসরকারি হিসাবে অন্তত ২০০ জন নিরন্ন চাষী-মজুর, মা-বোনকে হত্যা করেছিল। এই বর্বরোচিত পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন ১ সেপ্টেম্বর কলকাতার স্কুল-কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধিক্কার জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেই মিছিলের ওপর আবারও গুলি চলেছিল, ছাত্র শহীদদের রক্তে রাজপথ হয়েছিল রঞ্জিত। তাদের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহীদবেদী। প্রতি বছর বামপন্থী চেতনার সংগ্রামী মানুষেরা এই বেদীতে মাল্যদান করেন। ১ সেপ্টেম্বর সংগ্রামী ছাত্ররা পালন করে ছাত্র শহীদ দিবস। ডিএসও'র মিছিল এসে থামলো শহীদবেদীর সামনে। 'শহীদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ' স্লোগানে গোটা চত্বর মুখর হয়ে উঠল। বেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়, সর্বভারতীয় মুখপত্র 'স্টুডেন্টস প্লেজ'-এর পক্ষ থেকে কমরেড মৃদুল দাস ও বাংলা মুখপত্র ছাত্র সংহতির পক্ষে কমরেড কমল সাঁই। এরপর মিছিল এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে এসে থামে রানি রাসমণি রোডে, মাধাই হালদারের শহীদবেদীর সামনে। ১৯৯০ সালে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে ১৩টি বামপন্থী দলের দ্বারা পরিচালিত পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকার ৩২ জনকে গুলিবিদ্ধ করে, শহীদের মৃত্যুবরণ করেন কিশোর কমরেড মাধাই হালদার। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই নৃশংস গুলি চালনায় বিন্দুমাত্র অনুশোচনা করা দূরে থাক, দম্ভভরে বলেছিলেন, নিরামিষ আন্দোলনকে আমিষ করা হল। স্তম্ভিত হয়ে মানুষ চিনতে পারল 'বামফ্রন্ট সরকার, গণআন্দোলন দমনের হাতিয়ার।' ঐদিন সকালে শহীদবেদীতে মালা দিয়ে বিকালে মিছিলের ওপর গুলি চালিয়ে যারা শহীদ করে, তাদেরকে গোটা বাংলার সংগ্রামী মানুষ সেদিন ধিক্কার জানিয়েছিল। রানি রাসমণি রোডে শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী। তখনও মিছিল ঢুকছে রানি রাসমণি রোডে, শেষভাগ তখনও বৌবাজার মোড়ে। এরপর কমরেড গৌড়ীর নেতৃত্বে ৫ জনের এক ছাত্র প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি পেশ করতে যান। রাজ্যপাল দাবিগুলি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। শহীদবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে সংগঠনের সর্বভারতীয় অফিস সম্পাদক কমরেড মৃদুল দাস বক্তব্য রাখেন। তিনি আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশন সফল করার আহ্বান জানান। এরপর ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আন্দোলনের কমিটি গঠন করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করার বার্তা নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। কারণ লড়তে হবে বহুদূর। ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী শিক্ষার সুযোগ ক্রমাগত সঙ্কুচিত করার যে পথ নিয়ে চলছে তার বিরুদ্ধে লড়াই এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই।

১ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন এ আই ডি ও স ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্য ছাত্রনেতারা।

পুঁজির গোলামের মুখে মার্কসের নাম কেন

তিনের পাতার পর

বহুদিন আগেই দেখিয়ে গেছেন, বিশ্বজুড়েই পুঁজিবাদ তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে এসে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে তার যতটুকু প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, আজ সেটুকুও সে হারিয়েছে। ভারতীয় পুঁজিবাদ আজ শুধু সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রই অর্জন করেনি, আঞ্চলিক স্তরে একটি 'সুপার পাওয়ার' হিসাবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির আসরে ভারতের ঘন ঘন ডাক পাওয়া এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, বা বিদেশমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের দেওয়া বক্তৃতা, অথবা নিরাপত্তা পরিষদে স্থান পাওয়ার জন্য ভারতের উদগ্র চেষ্টাতেই এর প্রমাণ অহরহ মিলছে।

একদিন শিল্পের প্রয়োজনেই পুঁজি এসেছিল। পুঁজি সেদিন শিল্প স্থাপন করতে গিয়ে শুধু পুরানো সামন্তী অর্থব্যবস্থাটিকেই ভাঙেনি, ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে, সাথে সাথে সামন্তী সামাজিক কাঠামোটিকেও ভেঙেছিল। কিন্তু উনিশ শতকে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পুঁজির লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী উন্নয়ন নয়, পরদেশ লুণ্ঠন। রচনার ছত্রে ছত্রে মার্কস ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির সর্বাত্মক শোষণ ও ভয়াবহ ভূমিকা উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেছেন — ''ব্রিটিশরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার থেকে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এশীয় স্বৈরাচারের ওপর ... ইউরোপীয় স্বৈরাচারের পত্তন ঘটিয়ে ... এক দানবীয় জরাসন্ধ সৃষ্টি করেছে।'' মার্কস খুব স্পষ্টভাষায় বলেছেন — ''ইংরেজ বুর্জোয়ারা, হয়ত বা বাধ্য হয়ে, যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা সামাজিক অবস্থার বাস্তব পরিবর্তন ঘটবে না — এগুলি শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে না, জনগণ কর্তৃক তার মালিকানা দখলের উপরেও নির্ভর করে।''

পরিকাঠামোর বা পুঁজির অভাব এই মুহূর্তে ভারতীয় পুঁজিবাদের সমস্যা নয়। বরং অতিরিক্ত পুঁজিই আজ তার সমস্যা, বাজারের সংকটই আজ তার সমস্যা। বিগত ছয় দশক ধরে ভারতের উৎপাদন শক্তি বিপুলহারে বেড়েছে, কিন্তু ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর তীব্র শোষণে দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। অপরদিকে পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজির পাহাড় জমিয়েছে। অথচ অর্থমন্ত্রী এমন একটা ভাব দেখাচ্ছেন, যেন পুঁজির অভাবেই ভারতীয় অর্থনীতির এই সংকট। বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পুঁজি এখন দেশের বাইরে খাটছে। ভারতীয় কোম্পানিগুলি বিদেশের বাজারেও বিপুল পরিমাণ মুনাফা করছে। একের পর এক বিদেশি কোম্পানি কিনে নিচ্ছে। বিপরীতে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে উঠছে। হাজার হাজার কল-কারখানা বন্ধ; লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে; কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে; বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে ; নারী বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে; খরা-বন্যা-ভাঙনে হাজার হাজার মানুষ পথের ভিখারি; শিক্ষাস্বাস্থ্য বাজারের দুর্মূল্য পণ্য; বুদ্ধিজীবীরা মালিকের দুয়ারে মজদুরি করছে। মার্কস চূড়ান্ত শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে সর্বাগ্রে ভাঙার কথাই বলে গিয়েছেন। সারা জীবন তিনি পুঁজির শোষণ থেকে শোষিত মানুষের মুক্তির কথাই ভেবেছেন, তার জন্যই লড়াই করেছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করার মধ্য দিয়ে পুঁজির শোষণের অবসান ঘটানোর পথেই যে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি — তা মার্কসবাদই দেখিয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, 'মার্কসবাদ অচল' এবং 'পুঁজিবাদই একমাত্র পথ' বলে যাঁরা অহরহ ঘোষণা করেন, সেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির সেবক চিদাম্বরম কংগ্রেসের উদার অর্থনীতির ব্যাখ্যায় হঠাৎ কার্ল মার্কসকে টানলেন কেন? মার্কস তথা মার্কসবাদের সাথে বিপ্লব, শোষণমুক্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি জড়িয়ে রয়েছে এবং সেগুলি সম্পর্কে রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের যে আবেগ রয়েছে, অর্থমন্ত্রী তাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী আর্থিক সংস্কারের নীতিকে এ রাজ্যের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন। সেজন্যই পরিকল্পিতভাবেই তিনি মার্কসের বক্তব্যের উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি ঘটিয়েছেন।

কেবল চিদাম্বরমই নন, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ৮ জুলাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেছেন — ''ব্রিটিশ এদেশে শুধু শোষণ নয়, অনেক উন্নয়নও ঘটিয়েছে।'' বিজেপি নেতা জগমোহনও একই সুরে স্টেটসম্যান পত্রিকায় (১ ও ২ সেপ্টেম্বর) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিবাচক দিকগুলি বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর পশ্চিমবঙ্গে শাসক সিপিএম তো ব্রিটিশ পুঁজিলগ্নী সংস্থা ডিএফআইডি'র ঋণের পরম ভক্ত। এমনকী প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের আগমনে কলকাতা শহরে লাল কার্পেট পেতে ভজনা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। কাজেই এটা কোন ব্যক্তিবিশেষের মত নয়। আজ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে শাসক দলগুলি যেভাবে অভ্যর্থনা করে দেশে ডেকে আনছে, সেটা দেশের জনগণকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই মনমোহন-চিদাম্বরমদের এভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করতে হচ্ছে। তারা জানে, দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এদেশের জনগণ, 'সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কল্যাণকামী চরিত্র আছে' এ প্রচার কোনভাবেই সত্য বলে মেনে নেবে না; ইতিহাসের শিক্ষা থেকেও না, বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও না।

সেদিন চিদাম্বরমের ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে সিপিএমের যে সমস্ত তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা বসে মন্ত্রীর জ্ঞানদান শুনলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক বলেও দাবি করেন, তাঁরা কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। বলেননি যে, অর্থমন্ত্রী, আপনি মার্কসকে বিকৃত করছেন। আসলে একথা বলার মতো সৎ সাহস সিপিএম নেতাদের নেই। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির গোলামি করার যে উদ্দেশ্য থেকে চিদাম্বরম একথা বলেছেন, সিপিএম নেতাদের উদ্দেশ্যও আজ আর তার থেকে আলাদা কিছু নয়। একথা চিদাম্বরমের ধৃষ্টতায় নীরব থেকে সিপিএম নেতারাই প্রমাণ করে দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁরা এ রাজ্যে তাঁদের সংস্কার নীতির প্রতি কখনও প্রধানমন্ত্রীর, কখনও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর, কখনও বা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলির কোন উচ্চপদস্থ কর্তার সমর্থন দেখিয়ে রাজ্যের মানুষকে বলতে চাইছেন, 'দেখ, এঁরা আমাদের কাজের প্রশংসা করছেন, ফলে আমরা সঠিক পথেই রয়েছি।' আগ্রহী মানুষ ইতিহাস খুঁটিয়ে বিচার করলেই এখন ধরতে পারবেন যে, সিপিএম কোনও দিনই একটি মার্কসবাদী দল ছিল না। মার্কসবাদ ছিল তাদের বাইরের আলখাল্লা, যা দেখিয়ে তারা শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের গদির স্বার্থ, পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। আজ পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সংকটের সময়ে মার্কসবাদের সেই আলখাল্লাও তাদের ধরে রাখা কষ্টকর হচ্ছে, তা খসে পড়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ছে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

পুরুলিয়া জেলাকে খরা কবলিত ঘোষণার দাবি

অনাবৃষ্টির ফলে পুরুলিয়া জেলার ৮০ ভাগ জমিতে চাষ হয়নি, যতটুকু চাষ হয়েছে তাও জলের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পুকুর, কুয়ো, নদীতে জলস্তর ক্রমাগত নীচের দিকে নামছে। বর্ষাকালেও তাপমাত্রা ৪০° সেলসিয়াস-এর ওপর। ফলে পুরুলিয়ার মাটি জ্বলছে, খেতেখামারে কাজ নেই। রুজি-রোজগারের অভাবে শুরু হয়ে গেছে অর্ধাহার, অনাহার। এই অবস্থাতেও সরকার ও প্রশাসনের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। সরকারি সাহায্য বলতে কিছু নেই। নির্বিকার ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চাপে দাবি আদায় করা ছাড়া পুরুলিয়ার দরিদ্র মানুষগুলির সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। এই অবস্থায় ৩১ আগস্ট ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে এবং ১৯৯০ সালের বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদ কমরেড মাধাই হালদার স্মরণে শহীদ দিবসে অল ইন্ডিয়া কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন গরিব চাষী ও গ্রামীণ মজুরদের সংগঠিত করে জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভসমাবেশ সংগঠিত করে। জেলার প্রায় পাঁচ শতাধিক চাষী-মজুর ১৬ দফা দাবি সম্বলিত ব্যানারে সুসজ্জিত হয়ে শহরের বিভিন্ন মোড়ে সভা করে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। সমাবেশ থেকে দাবি ওঠে, অবিলম্বে জেলাকে খরা কবলিত ঘোষণা করে জেলার সাধারণ মানুষের কাজ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ ভূতনাথ মাহাতো, অনিল বাউরী, কালীপদ মাহাতো। কমরেড সীতারাম মাহাতোর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। জেলাশাসক দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্যের কর্মসূচি অতি দ্রুত শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কোলাঘাটে উচ্ছেদবিরোধী সভা

কোলাঘাট রেল স্টেশন এলাকার জমি থেকে দোকান এবং বসতি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের চাপে অবশেষে গত ২৩ আগস্ট বিডিও এক সভা আহ্বান করেন। সেখানে রেলের উচ্চপদস্থ অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কোলাঘাট স্টেশন রোড ও শরৎ সেতু এরিয়া বাজার কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় — লীজ বা ভাড়ার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুযোগ দিতে হবে, উন্নয়নের নামে গরিব দোকানদারদের উচ্ছেদ করা চলবে না, দোকান উচ্ছেদ করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা চলবে না ইত্যাদি। এস ইউ সি আই দলের প্রতিনিধি কমরেড শঙ্কর মালাকার জাতীয় হকার নীতি রূপায়ণের দাবি জানান।

৩১ আগস্ট শহীদ দিবসে সমাবেশ

৩১ আগস্ট, '৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদ ও '৯০ সালে মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের শহীদ মাধাই হালদার স্মরণে রানি রাসমণি রোডের সমাবেশ। সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল, বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-র কমরেড সৌমেন বসু, বলশেভিক পার্টির কমরেড চিত্ত নাথ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির কমরেড চিত্ত গোস্বামী

মুম্বইয়ের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে চিকিৎসা শিবির

বন্যা-পীড়িতদের চিকিৎসার জন্য অল ইন্ডিয়া মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহায়তায় এস ইউ সি আই মুম্বইয়ের বিভিন্ন স্থানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যেই পাল নগর, মৌর্য কম্পাউন্ড, কদমওয়াড়ি, কান্দিভ্যালি (পূর্ব), মতিলাল নগর, গণপত পাতিল নগর, লিঙ্ক রোড, আই সি কলোনি, বরিভ্যালি (পশ্চিম) প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা শিবির হয়েছে। থানে জেলার অ্যাম্বিভ্যালি, কল্যাণ, অশোকনগর, বালধুনি, মাটি, টিওয়ালা, খাড়ুপাতা প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৪০০০ মানুষের চিকিৎসা করা হয়েছে এবং ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এগুলির সাথে অন্যান্য দুর্গত এলাকাতেও চিকিৎসা শিবির চলবে। যে সমস্ত স্থানে সরকারি রিলিফ পৌঁছায়নি, সেখানে মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলনের মাধ্যমে রিলিফ আদায় চলছে। ছবি ঃ মেডিকেলস সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসকরা দুর্গতদের চিকিৎসা করছেন ।

বিহারে বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

বিহারে বিড়ি শ্রমিকদের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। এখানকার বিড়ি শ্রমিকরা এক হাজার বিড়ি বেঁধে ২০/২২ টাকা মজুরি পান, প্রভিডেন্ট ফান্ড কোন শ্রমিকের নেই, সরকারি পরিচয়পত্র এখনও অনেকে পাননি। এদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন। গত ২৮ আগস্ট চাঁয় মধ্য বিদ্যালয়ে প্রথম জমুই জেলা বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন এক হাজার বিড়ি প্রতি ১০০ টাকা মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পরিচয়পত্র প্রদানের দাবি জানায়। সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে তিন শতাধিক বিড়ি শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে শতাধিক মহিলা শ্রমিক ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন চাঁয় পঞ্চায়েত প্রধান প্রকাশ কুমার সিন্‌হা। বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের জমুই জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির প্রসাদ সিংহ, সভাপতি কমরেড ভগীরথ রাম, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য ধরমদেও যাদব, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রমোদ কুমার মণ্ডল। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অরুণ সিং। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'বিড়ি শ্রমিক সহ সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটি আজ ঐতিহাসিকভাবে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের ও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তিনি আরও বলেন, এই সংগ্রামে হাতিয়ার হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। তার ভিত্তিতে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রতিনিধি সম্মেলনে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। কমরেড ভগীরথ রামকে সভাপতি এবং কমরেড শিশির প্রসাদ সিংহকে সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

সাপ্তাহিক গণদাবী'র

গ্রাহক হোন

চাঁদার হার (ডাকযোগে)

বার্ষিক — ৯১ টাকা

ষান্মাসিক — ৪৬ টাকা

টাকা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা - ১৩

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এন আর আই কোটা ও ম্যানেজমেন্ট কোটা বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে সমস্ত আসনে ভর্তি এবং নির্ধারিত ফি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে পার্লামেন্টে উপযুক্ত আইন প্রণয়নের দাবিতে ও শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের বিরুদ্ধে

এ আই ডি এস ও এবং

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার-এর উদ্যোগে

২৩ সেপ্টেম্বর

দিল্লিতে জাতীয় কনভেনশন

স্থান ঃ কনভোকেশন হল

লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ, নয়াদিল্লি

১০ - ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে, বেসরকারীকরণ-ডিপ্লয়মেন্ট-মার্জার-আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের

২য় রাজ্য সম্মেলন

স্থান ঃ ঠাকুর পঞ্চানন হল, কোচবিহার

বক্তা ঃ কমরেড এম সি ত্যাগী — সর্বভারতীয় সভাপতি
কমরেড অমর রায় — রাজ্য সভাপতি
কমরেড সনৎ দত্ত — রাজ্য সভাপতি, ইউ টি ইউ সি - এল এস
প্রধান অতিথি ঃ প্রাক্তন সাংসদ কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in